প্রথম অধ্যায়

আখ্যান ঃ একটি সংক্ষিপ্ত প্রয়াস

আখ্যান শব্দের অর্থ হল কথন, উক্তি বা বচন। বর্ণনা বা বিবরণ অর্থে ব্যবহার করা হয়। সংস্কৃত সমালোচকেরা আখ্যানকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন একটি হল আখ্যায়িকা অন্যটি হল 'কথা', আখ্যায়িকা বলতে বাস্তবিক ইতিহাস সম্বন্ধে ঘটনার বিবরণকে বোঝানো হয়েছে, 'কথা' বলতে কাল্পনিক কাহিনি নির্মাণকে বোঝানো হয়েছে। কথার মধ্যে কথকথা, কথোপকথন ইত্যাদি একাধিক বিষয় চলে আসতে পারে। এর উপর ভিত্তি করেই সাহিত্য। আগে সাহিত্য তার পরে আখ্যানে গিয়ে জটিল ভাবনা। গল্প বলা এবং গল্প শোনার অভ্যাস আমাদের চিরায়ত একটি প্রবৃত্তি। মানুষ গল্প করতে ও শুনতে দুই ভালোবাসে। গল্প বলাতেই আমরা যেন কল্পনার জগতে চলে যাই। বাস্তবের রুক্ষ-শুষ্ক জটিল জীবনের বাইরে গিয়ে বিচরণ করতে চাই এক অন্য লোকে। আর এখানেই তৈরি হয় আখ্যান ভাবনা। বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে যে বিস্তর ফারাক সেই শুন্যস্থান পূরণের জন্য যে মাধ্যমে তৈরি করি তারই নাম আখ্যান।

বিশ শতকের শেষের দিকে নানা ধরনের সাহিত্যতত্ত্ব ভাবনাকে আন্দোলিত করেছে। তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হল আখ্যানতত্ত্ব। খুব সহজ কথায় বলতে পারি আখ্যান সম্পর্কিত আলোচনার যে তত্ত্ব তাই আখ্যানতত্ত্ব। কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় এই তত্ত্বকে ধরা যায় না। সময়ের সাথে সাথে সমাজ পরিবেশ বদলায়। বদল হয় মানুষের মানসিক ভাবনার। সেই সূত্রেই বদল হয় তত্ত্বের। যতই আধুনিক তত্ত্ব বিজ্ঞানের পরিবর্তন হয় পরিবর্তন সাধিত হয় আখ্যান রচনায়, বর্তমানে আখ্যান বলতে শুধু কাহিনিকে বোঝায় না, কাহিনি বর্ণনার পদ্ধতিকে ও আখ্যান তত্ত্বের অর্ন্তভুক্ত করা হয়। আখ্যান সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষন করেছে।

> ‘‘গল্প বলছি শোন’’—এভাবেই কোনো এক সুন্দর অনির্দেশ্য অতীতে আদি কথক তাঁর ইচ্ছুক অনিচ্ছুক শ্রোতাদের সম্বোধন করে থাকবেন। কথা বয়নের সেই যে শুরু হল, কথার যাদুতে মুগ্ধজয়াদের আকাঙ্খাও সেদিন থেকে অবারিত হয়ে উঠল। কী বলছেন কথক, কীভাবে পেশ করেছেন বৃত্তান্ত, সময়ের কত মাত্রা ব্যক্ত হচ্ছে তাতে, অভিজ্ঞতা ও কল্পনার অনুপাত কতখানি, মানুষের জগতে মিশে যাচ্ছে কিনা না-মানুষী ভুবন ঃ এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ ছিল না কারণ কাহিনির মায়ায় বুঁদ হয়ে মনে হত কথা আসত সমান আর কথকথার সূত্রধার ঈশ্বরপ্রতিম।’’[১]

এখন সে সময়ও নাই, শ্রোতাও নাই সূত্রধর ও নাই। অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সময়ের সরণি বেয়ে জটিল জীবন যাপনের মধ্যদিয়ে পাঠক সমাজ তৈরি হয়েছে। সূত্রধর হয়েছে লেখক। অবস্থানগত পরিবর্তনও হয়েছে। শ্রোতা সূত্রধারের সামনে বসেই কথকথা শুনতে পারতো। যেকোনা গল্পের বা কাহিনির বা আধুনিক আখ্যানের প্রভাব শ্রোতাদের মুখ দেখেই বোঝা যেত। বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে পাঠক ও লেখকের শতযোজনের দূরত্ব, পাঠক লেখককে দেখতে পান না আবার উল্টোদিকে লেখক ও পাঠককে দেখতে পান না, তার মন বোঝার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। লেখক কল্প পাঠক ভাবনা থেকেই আখ্যান লিখে থাকেন, পাঠক আখ্যান পাঠ কালে কল্প লেখক সৃষ্টি করে দেন। এই দূরত্বের মিল কখনই সম্ভবপর হয় না। তাই আখ্যান পাঠক মানুষের জগতে মিশে যাচ্ছে কিনা তা বোঝার একমাত্র উপায় সামাজিক মানুষের আচরণ। এই আচরণ ভাবনা থেকেই নানান তত্ত্ব প্রস্থানের সূচনা হয়। যার মধ্যে একটি হল আখ্যানতত্ত্ব।

আখ্যান বলতে বোঝায় বিশেষ প্রকার কাহিনি, একথা আগেই বলেছি। এই কাহিনি বর্ণনা করার রীতি বা পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনাই হল আখ্যানতত্ত্ব। আখ্যান সম্পর্কিত আলোচনা।

> ‘‘সামাজিক ইতিহাসের গভীরে অহরহ যে সব রূপান্তর ঘটে চলেছে, তাদের সামূহিক অভিঘাতে বিষয়ও বিষয়ী। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত, ব্যক্ত ও অব্যক্তের আন্তঃসম্পর্ক আর কিছুতেই পূর্বানুমিত থাকছে না। বার বার যেন শূন্যায়তন

থেকে আখ্যানের পূনঃসূচনা ঘটেছে। সাধারণত সময়ও পরিসর বলতে যা বুঝি, তা থেকে জন্ম নিয়েও কীভাবে আখ্যান অবধারিত ভাবে নিজস্ব সময় ও পরিসরের প্রতীত সৃষ্টি করে সে এক বিপুল বিস্ময়। ভাষায় কৃৎকৌশল দিয়েই তার তাৎপর্য নিংড়ে নিতে হয়;"[২]

আখ্যানকে সঠিকভাবে আখ্যানে পরিণত করার ক্ষেত্রে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র কাহিনি শুনে পাঠক বর্গের চাহিদা মিটছে না, তারা আরো কিছু পেতে চায় প্রতিবেদন থেকে। জটিল জীবন যন্ত্রণা, সামাজিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি সমস্ত বিষয়ই আজ আখ্যানের বিষয় হয়েছে। চাঁদের দেশের গল্প, আজ আর পাঠককে মুগ্ধ করতে পারে না, তাই সময়ের সাথে সাথে আখ্যানও তার সমস্ত বন্ধন খুলে নিজেকে সমস্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত করেছে, শুধুমাত্র গল্প উপন্যাসই নয়; কবিতা, গান আমাদের মহাকাব্য সমস্ত ক্ষেত্রেই আখ্যান প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাংলা সাহিত্যে আখ্যান কোনো নতুন ধারণা নয়। শুধুমাত্র তার পরিমার্জন ঘটেছে। আখ্যান ধারণার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের আলোচনায়। আখ্যান কাব্য এই যুগের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। তবে সেই আখ্যানের রচনার একটি নির্দিষ্ট রীতি ছিল। ভক্তি রসের আবির্ভাব ছিল বেশি। কোনো এক ব্যক্তি দেবীর স্বপ্ন পেল এবং পরের দিন থেকে সে কাব্য লিখতে আরম্ভ করল, অর্থাৎ কবি হয়ে গেল। এটা বিশ্বাস করতে আমাদের কষ্ট হয় কারণ আমরা জেনেছি 'সবাই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'। কিন্তু তৎকালীন সময়ে এই বিষয়টা বিশ্বাস করতে বিশেষ কিছু বেগ পেতে হয়নি। মানুষ সময়ের দাস। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, জীবন-মরণ, হাসি-কান্না সমস্ত কিছু বদলে যায়। আজ যা বিশ্বাসযোগ্য কাল তা নাও থাকতে পারে। কারণ জীবন নিয়ত পরিবর্তনশীল আর জীবন নিয়ে যেহেতু আখ্যান অতএব আখ্যানও নিয়ত পরিবর্তনশীল।

পূর্বে বলা হয়েছে আখ্যানের সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন মত আছে। Gerald Prince, Shlomith Rimmon Kenan প্রমুখের বক্তব্য অনুযায়ী আখ্যানে একটি মাত্র ঘটনা কখনোই থাকবে না,

অন্তত্পক্ষে দুটি ঘটনা থাকবেই। আর এই ঘটনাগুলি আগে থেকেই কার্যকারণ স্বীকৃত হবে না। সুতরাং 'হাতি কাদায় পড়ে গেল' এই বাক্য একটি ঘটনা নয়।

আকরণবাদীদের মত অনুযায়ী আখ্যান দুটি অংশে বিভক্ত, একটি হল কাহিনি, কাহিনি বলতে এখানে ঘটনার পরম্পরাকে বোঝানো হয়েছে, যা নির্দিষ্ট কাল পারম্পর্যকে মেনে রচিত হবে। অন্যটি হল সন্দর্ভ। সন্দর্ভ বলতে কাহিনি উপস্থাপকের রীতিকে বোঝানো হয়েছে। কোন পদ্ধতিতে কাহিনি বর্ণনা করা হবে, সেই অনুযায়ী কাহিনি এগিয়ে চলবে। এভাবেই কাহিনি এবং সন্দর্ভের মধ্যেকার যে সম্পর্ক রয়েছে তাকে ভাষায় ব্যক্ত করাই হল আখ্যান।

স্মিথের মত অনুসারে আখ্যানের যেমন নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই তেমনিই তার কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। প্রতিটি আখ্যানই তার নিজস্বতায় বর্তমান। একটি নির্দিষ্ট আখ্যান একাধিক পর্বে একাধিক আখ্যান নির্মিত হয়।

সাহিত্য সাধারণভাবে বিষয় কেন্দ্রীক। কিন্তু বিষয় অতিক্রম করাই হল সাহিত্য শিল্প। সাহিত্য কথার শিল্প, তাই কথাসাহিত্যের অংশ হিসেবে উপন্যাসের 'বিষয়' তার উপকরণ মাত্র। সেই বিষয়কে নির্দিষ্ট নিয়মে, অর্থাৎ বলতে পারি সুনির্দিষ্ট প্রকরণই উপন্যাস শিল্প। কোনো একটি আখ্যান কোনো একটি উপন্যাস, গল্প বা অন্য কোনো সাহিত্য প্রকরণ কেন নয়? এই আলোচনার সূত্রেই বিশ শতকে আখ্যানতত্ত্ব বা Narratology নামক প্রস্থানের সূচনা হয়েছে।

> ''মূলত ভাষার সংগঠন নিয়ে আলোচনার সূত্রে এর জন্ম। যদিও কখনো প্রয়োগবাদী দর্শন, কখনো চিহ্ন বিজ্ঞান, কখনো নৃতত্ত্ব বা লোকসংস্কৃতি এবং বিধ বিদ্যার মিলিত ভূমিকায়-এর তত্ত্ব কাঠামোটি গড়ে উঠেছে। আখ্যানের গঠন ও রীতিকে তার রূপায়ন প্রক্রিয়া থেকে বুঝে নেওয়ার এক তাগিদ তৈরি করে এ তত্ত্ব।''[৩]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি প্রত্যেক আখ্যানেরই একটি নিজস্ব শিল্প কৌশল আছে। তা সত্ত্বেও আখ্যানকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা অর্থাৎ তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বিচার করা সম্ভব। সর্বোপরি আখ্যান লেখকের সাপেক্ষেও বিচার করা যেতে পারে।

আখ্যান text কে তার context থেকে বিচ্যুত করেও বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। কথাসাহিত্য যেহেতু কথার শিল্প, তাই শিল্প বলতে মূলত কৌশলের বিষয়কে বোঝায়। এখানে সামান্য অসুবিধা আছে,

> ''আমাদের কথাবার্তায় 'কথা' তার অজস্র অর্থ নিয়ে হাজির। আমরা কথা বলি, কথা দিই, কথা রাখি বা রাখি না, কথার কথা বলে অনেক কথাই উড়িয়ে দিই। আবার 'কথা'র পাশাপাশি 'ন্যারেশন' অর্থে বর্ণনা বা বিবরণ জাতীয় শব্দও বহুকাল প্রচলিত এদেশে। ফলে ন্যারেটিভের পারিভাষিক বিশিষ্টতা কেবল কথার মধ্যে আঁটে না। পরিভাষার যেমন অযথা খটমট হওয়ার প্রয়োজন নেই, তেমনই তাকে সচল হতে হয় আটপৌরে ব্যবহারের অতি সচলতা এড়িয়ে। হয়তো এই কারণেই বহু ব্যবহার্য কথার সঙ্গে সাহিত্য বা শিল্পের গোজুড় জুড়ে জুড়ে কথা সাহিত্য বা কথা শিল্পের অবতারণা করা হয়েছে।''[৪]

এক্ষেত্রে আখ্যান বা Narrative কে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটকে ফেলা হয়, আদতে আখ্যানতো সীমার দ্বারা বদ্ধ নয়। কথাসাহিত্য বললে আমাদের মতো গল্প উপন্যাসের কথাই উঠে আসে। কিন্তু আখ্যান কী শুধু গল্প উপন্যাসের বিষয়, মধ্যযুগীয় কাব্য, আধুনিক কবিতায়, জীবনী আত্মজীবনী ইত্যাদি বিষয়ে কী আখ্যান আজ উপস্থিত। তা তো নয়, আখ্যানের বহুবিধ রূপ ও বিচিত্র কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রোলা বার্তকে সমরস করা ছাড়া উপায় থাকে না, তাঁর মতে—

> ''Moreover, in this finite variety of forms if is present at all times in all place in all societies; indeed narrative starts with the ver history of mankind, there in not there has never been anywhere, any people without narrative, all classes, all human group care their stories, and very often those stories are enyoyed by men of different and oppo-

> site cultural backgrounds : narrative remains largely un-concerned with good or bad literature. Like life it self is their international, trans historical transcultural."[৫]

অর্থাৎ আখ্যানের যে বিভিন্ন ধরনের কথা বলেছেন তাদের সকলের মধ্যেই একটি সাধারণ সূত্র আছে। তাকেই আমরা আখ্যান ধর্ম হিসেবে ধরে নিতে পারি। এর নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা আজও তৈরি হয়নি। এটিকে প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মানুষের জীবন অভিজ্ঞতাকে অর্থপূর্ণ এবং যুক্তি যুক্ত আধারে পরিবেশন করাই হল সেই প্রক্রিয়া। এ প্রসঙ্গে হোডন বোয়াইট এর মত স্মরণ করতে পারি—

> "the problem of how to translate knowing into telling the problem of fashioring human experience into a form assimilable to stowctures of meaning that are generally human rather than culture, specific."[৬]

প্রত্যেক ব্যক্তি এবং গোষ্ঠির নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। সেই সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাকে বাস্তবায়িত করে তোলার জন্য নানা ধরনের কোড তৈরি করা হয়। আখ্যানে সেই সব কোড ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের text নির্মাণ করা হয়। নির্মাণের শেষে আখ্যান তার কোডের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিশ্ব সংস্কৃতির সাথে মেলবন্ধন ঘটাতে চায়। সেখানে মানব সংস্কৃতির কথাই মুখ্য হয়ে ওঠে, কারণ শিল্পকে কোনো সীমার মধ্যে আটকে রাখা যায় না। তা সে যে শিল্প হোক না কেন।

আখ্যান পরিবেশনে প্রক্রিয়াগত যে কৌশল তার জোরেই নির্মাতা, পাঠক বা শ্রোতার মনে আকাঙ্খার সৃষ্টি করে। কথা সাহিত্য কথার শিল্প বলা না বলা কথা নিয়েই এই সাহিত্য। কোথায় কখন কীভাবে কতটা বলা হবে তা নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে আখ্যান নির্মাতার কৌশলের ওপর। "কথাশিল্প সেই অর্থে কথা না বলারও শিল্প"[৭] কথা বলা না বলা সবটাই নির্ভর করে লেখকের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপরে। এ ব্যাপারে তিনি স্বাধীনতা ভোগ করেন। কথা সাহিত্যের আখ্যানে কথক থাকে। কথকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই কথন উপস্থাপন করা হয়। কথক বদলে গেলে কথন ও বদলে

যায়। কথক কে হবেন তা ঠিক করেন লেখক। লেখক নিজেও কথক হতে পারেন আবার কাহিনির কোনো মুখ্য চরিত্রকে কথক হিসেবে নিয়ে আসতে পারেন। তার মুখ দিয়েই আখ্যান বর্ণনা করা হয়। কথক বদলের সঙ্গে সঙ্গে আখ্যানের বিষয়, চরিত্রের ধরন ইত্যাদি একাধিক বিষয় এর পরিবর্তন ঘটে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস যদি নায়কের কথা না হয়ে নায়িকার হত তাহলে আমরা এই শ্রীকান্তকে হয়ত পেতাম না, সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাস যদি একজনের কথা হত তাহলে অন্য 'জাগরী'র জন্ম দিত বলেই মনে হয়। অর্থাৎ আখ্যান কৌশলই লেখক ও পাঠকের মধ্যেকার আকর্ষণকে ধরে রাখে। দুই শত সহস্র যোজন দূরত্বের ভাবনাকে একঘরে বন্ধ করে এই আখ্যান কৌশল।

আখ্যানতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা অ্যারিস্ততলকে অস্বীকার করতে পারি না, তাঁর প্লট এর ধারণাকেই আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে আধুনিক আখ্যানতত্ত্বের আলোচনায়, অ্যারিস্ততল প্লটের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা বলেছেন, "the arrangement of incidents" সে কথা আধুনিক আখ্যানতত্ত্বের আলোচনায় সমানভাবে প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে। বাস্তবিক ঘটনা নিয়ে লেখক তাঁর রচনাকর্ম করেন। কিন্তু সেখানে বাস্তবিক ঘটনার ক্রম সম্পাদন রক্ষিত হবে না লেখক তাঁর পছন্দমতো ঘটনাক্রমকে সাজাবেন তা সম্পূর্ণ লেখকের স্বাধীনতা। বাস্তবে কতটা নেবেন, কতটা কল্পনা মেশাবেন, কোন ঘটনাকে গুরুত্ব দেবেন, কোন ঘটনা কে গৌণ করে দেখাবেন, কোন ঘটনা আগে দেখাবেন কোন ঘটনা পরে দেখাবেন তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে লেখকের arrangement কৌশলের ওপর। এরজন্যই flash back এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন লেখক বা শিল্পী। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। পূর্বে বাস্তব ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ছাড়াও লেখক সম্পূর্ণ কল্পিত ঘটনার উপর ভিত্তি করেও তাঁর রচনা সৃষ্টি করতে পারেন। এর দৃষ্টান্ত আরো একাধিক লেখকের রচনায় দেখতে পাই।

'সৃষ্টির তত্ত্ব নয়, বিচারের তত্ত্ব' আখ্যানতত্ত্বের আলোচনায় একথা সত্যি হতে পারে। তত্ত্ব সৃষ্টি করে না, সৃষ্টিকে বিচার করতে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ তা সমালোচকদের হাতিয়ার।

কোনো সৃষ্টিশীলব্যক্তি আখ্যানতত্ত্ব পড়ে উপন্যাস লিখতে বসেন না, তার আয়োজন আছে বলেও মনে হয় না। কারণ একটি উপন্যাসের যে 'বহু' ব্যাপার তাতে কোনো একটি তত্ত্ব দিয়ে তাকে নির্ণয় করা যায় না। যদি এ রকম হত তাহলে উপন্যাসতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে কোনো মহৎ উপন্যাসই লেখা হত না, বাস্তবে তা হয়নি, বাখতিনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকেই একাধিক মূল্যবান উপন্যাস আমরা উপহার হিসেবে পেয়ে গেছি। এখানে আমরা বলতেই পারি আখ্যানতত্ত্ব আখ্যানশিল্পের বিশ্লেষণ করে তার দিকনির্দেশ করতে পারে না। তাই সাম্প্রতিক আখ্যানতত্ত্বে বিভিন্ন তত্ত্বের একটা সম্মিলিত রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাখতিনের 'নভেলাইজেশন' বা উপন্যাসতত্ত্ব সামনে আসার পর থেকে উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গেল। এর আগে পর্যন্ত আমরা আখ্যান এবং উপন্যাসকে একই গোত্রের মধ্যে ফেলে সরলীকরণ করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু বাখতিন তাঁর মত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন আমরা যাকে নভেল বলি অর্থাৎ বাংলায় যাকে উপন্যাস বলি তা একমাত্র পাঠযোগ্য শিল্প মাধ্যম। গঠনের ক্ষেত্রেও উপন্যাস অনেক বেশি নমনীয় এবং স্বাধীন স্বভাবের। উপন্যাসের ভাষা বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন উপন্যাসের ভাষায় নির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই। নিয়ত পরিবর্তনশীল এর ভাষা, এর কারণ হিসেবে অবশ্য ভিন্ন ভাষিকতার নানা উপাদানকে নিজের সাথে নিয়ে চলতে পারি, যেহেতু উপন্যাস জীবন্ত সংরূপ, এর কোনো নির্দিষ্ট রূপ এখনও নির্মিত হয়নি, তাই প্রতিনিয়ত, প্রতিমুহূর্তে এর ভাঙা গড়া চলতেই থাকে। মহাকাব্যের ক্ষেত্রে এ কথা আমরা ভাবতেই পারি না। কারণ মহাকাব্য এক মৃত সংরূপ, তার নির্দিষ্ট রূপ তৈরি হয়ে গেছে। নতুনত্বের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে কেউ যদি মহাকাব্য লেখার মানসিকতা রাখে তবে তাঁকে পূর্বনির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই রচনা করতে হবে, নয়ত তা মহাকাব্য হবে না। উপন্যাসের রচনার ক্ষেত্রে সেই বাধ্যবাধকতা এখনও লেখকের সামনে আসেনি। নির্দিষ্ট কোনোরূপে উপন্যাসকে আমরা বাঁধতে পারিনি।

আখ্যানতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাতের সময় থেকে অর্থাৎ বিশশতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই আমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, কোন উপন্যাস হয়, এই কোনের উত্তর খুঁজতে

গিয়েই বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রস্থানের জন্ম হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের সূচনা লগ্নে মূলত বঙ্কিম উপন্যাসের হাত ধরেই আমাদের সঙ্গে উপন্যাসের পরিচয়। সেখানে একটা নিটোল কাহিনি, অনেক চরিত্র নীতিকথার সুখ-দুঃখ। তবে সবটাই নিয়ন্ত্রণ করতেন লেখক, অর্থাৎ লেখক যেমন চাইতেন কাহিনি তেমন তেমন এগিয়ে যেত। লেখক এখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। পাঠক সেইসব উপন্যাস পাঠ করে আনন্দ উপভোগ করেছে। তখনকারমতো উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। কেউ প্রশ্নও তোলেনি এগুলিকে কোন উপন্যাস বলব, কোন গল্প বলব না অন্যকিছু। কিন্তু বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই এই ভাবনা সামনে আসতে থাকে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি সামনে চলে আসে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের মনে জটিলতা বাড়তে থাকে। কল্পনার স্বর্গরাজ্য বাসকরার মতো সময় মানসিকতা কিছুই ছিল না। বিশ শতকের প্রথমেই বিশ্বযুদ্ধ এবং মাঝামাঝি সময়ে আবারও বিশ্বযুদ্ধ মানুষের সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে বারুদের মত গুঁড়িয়ে দেয়। ফুল খেলার দিন অতিক্রম করার বাস্তবের কঠিন কঠোর মাটিতে দাঁড়িয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক চিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশনা আজ লেখকের মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে।

বাস্তব ঘটনা শ্রষ্টার স্পর্শে শিল্প হয়ে ওঠে শিল্পী প্রতিদিনের চেনা ঘটনাকে তাঁর প্রতিভাকে অচেনাভাবে পাঠকের বা দর্শকের সামনে হাজির করে। যিনি এই কার্যটি গঠন করেন তিনিই শিল্পী। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই প্রকাশ ঘটে বচনকে ভর করে। লেখক বিভিন্ন ধরনের কোড তৈরি করে নেন। তার মাধ্যমে একটি মেসেজকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে চান। সাধারণভাবে আমরা আখ্যান, গল্প, কাহিনি ঘটনা ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে বাধার সম্মুখিন হই। সাধারণ অর্থে সবই একই শ্রেণিভুক্ত করে তুলি। এর পিছনে অবশ্যই কাজ করে পূর্ব অভিজ্ঞতা। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে যে সব কাহিনি কাব্য রচিত হয়েছে তাদেরকে আমরা আখ্যান কাব্য হিসেবে পরিচিত হয়েছি। তাই যখন আখ্যানতত্ত্বের আলোচনায় প্রবেশ করি তখন এই বিষয়গুলির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার।

প্রথমত বলতে পারি কাহিনি একটি বিমূর্ত বিষয়। এই... বিষয়কে ভাষারূপ দান করে লেখক। কাহিনি কল্পনারও বিষয় হতে পারে। কাহিনির অদ্যসূত্রেই চরিত্রটা বা পাঠকৃতির নির্মাণ

করেন লেখক। যেহেতু কাহিনি বিমূর্ত বিষয় তাই সরাসরি তা পাঠকের বা গ্রাহকের সরাসরি গোচরে আসে না। টেক্সটের মাধ্যমে তা পাঠকের দৃষ্টি গোচর হয়। আর এই চরিত্রটা বা পাঠকৃতির মাধ্যমেই পাঠক বিমূর্ত কাহিনি বিষয়রস তা অনুভব করতে পারেন। পাঠকৃতি এবং কাহিনি একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে আর একটি থেকে আলাদা করা যায় না। তাই পাঠক বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমের মধ্যে একটি কাহিনিকে চিনে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে কাহিনি অনুভবে পাঠকের খুব একটা অসুবিধা হয় না। কাহিনির যে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যর জন্য এটা হয় তাকে narrativity বা আখ্যানতত্ত্ব বলে অবিহিত করা হয়। অনেক উপন্যাসই নাটকে রূপান্তরিত করে অভিনয় করা হয় বা চলচিত্রও করা হয়। কিন্তু মূল কাহিনি প্রতি ক্ষেত্রেই অপরিবর্তিত থাকে। প্রকাশ অনেক উপায়ে হতে পারে কিন্তু মূল বিষয় বা প্রতিপাদ্য সব ক্ষেত্রে একই থাকে। অর্থাৎ চরিত্রটিতে যে ঘটনার কথা বলা হয়, এবং সেই ঘটনার অংশগ্রহণকারি ব্যক্তিদের চরিত্র ব্যতিরেকে যে উপস্থিতি তাকে আমরা কাহিনি আখ্যা দিতে পারি। কাহিনি পাঠকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কানিহির শাব্দিক নির্মাণ হল পাঠকৃতি।

কাহিনির আলোচনা করতে গিয়ে আমরা অ্যারিস্টটল এবং তাঁর 'কাব্যতত্ত্ব'কে অস্বীকার করতে পারি না। তিনি কাব্যতত্ত্বের সপ্তম অধ্যায়ে কাহিনির গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেখানে ট্রাজেডির কাহিনি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—কাহিনিই ট্রাজেডিরমূল উপাদান। ট্রাজেডিকে ক্রিয়ায় অনুকরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ট্রাজেডি একটি সম্পূর্ণ ক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত। নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমগ্র বলতে তিনি আদি-মধ্য অন্ত্য যুক্ত ঘটনাকেই বোঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে কাহিনি হবে আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত একটি বিষয়, এর অন্যথা হলে তা কাহিনি বিবেচিত হবে না। আবার কাহিনির সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে নির্দিষ্ট আয়তন ও নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার কথা ও উল্লেখ করেছেন। আমাদের মহাকাব্যগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য কাহিনির এই রীতি মেনে, আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়। সব ঘটনাই কোন না কোনভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত।

আখ্যানতত্ত্বে আখ্যান সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে অ্যারিস্টটল-এর প্লট-এর ধারণাকে

অস্বীকার করা যায় না। কোন কোন সমালোচক অবশ্য এই প্লটের ধারণাকে আখ্যানতত্ত্বে স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধমত দিয়েছেন। তাঁদের মতে,—

> "the term 'plot' dose not appear in the techinical vocabulary of narrative semiotics. In truth, it could not find a place there, since it stems from the narrative understanding which semiotic rationality tries to provide an equivalent for or better, a simulation of." [৮]

অর্থাৎ সংগঠনবাদীরা আখ্যানতত্ত্বের আলোচনায় অ্যারিস্টটলের প্লটের ধারণাকে ব্রাত্য করেই রেখেছেন। এর কারণ হিসেবে অবয়ব সংস্থানের নীতিতে বা যুক্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। এর বিরুদ্ধ গোষ্ঠীরা অবশ্য আখ্যানের আলোচনায় প্লটের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন, তাদের সমর্থনে বলেছেন—

> "All narrative consists of a discaurse which integrates a sequence of events of human interest into the unity of a single plot."[৯]

অর্থাৎ সমস্ত আখ্যানকেই তাঁরা একটি মানবিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ডিসকোর্স বলে চিহ্নিত করেছেন।

আখ্যানের ক্ষেত্রে 'কথন' কে একটি অনিবার্য শর্ত হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। এক বা একাধিক কথক আখ্যানে থাকবেই। তাই নাটককে আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কারণ এক্ষেত্রে কথক থাকে না। চরিত্রের অভিনয়ের মাধ্যমে কাহিনি উপস্থাপনা করা হয়। আখ্যান হল 'story with a story letter'। তাই এ ক্ষেত্রে দুটি নির্দিষ্ট সময়কে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। একটি হল কাহিনির সময়, অন্যটি কাহিনি কথকের সময়। কথক যে একজন থাকবেই তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তবে সবসময় কথকের ফোকালাইজেশন ব্যবহার করেই কথা জগৎকে দেখানো হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা আখ্যানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়। কথক তার কাহিনির প্রয়োজনে এক

বা একাধিক চরিত্রকে ব্যবহার করতে পারেন। 'ঢোঁড়াই চরিতমানস'-এর কথক ঢোঁড়াইদের কেউ নয় তবুও ঢোঁড়াইদের দৃষ্টিকে ব্যবহার করে কথন জগৎ বুঝেছেন দক্ষতার সঙ্গে। অর্থাৎ ফোকালাইজেশন হল আখ্যানের একটি পরিকল্পনা যা স্থির করে দিতে পারে কাহিনির প্রেক্ষিত। তাই ফোকালাইজেশন আখ্যান উপাদান না হলেও অনেকেই একে আখ্যান কৌশল বলেই চিহ্নিত করতে পেরেছেন। এর সমর্থনে বলতে পারি

> "A choice... made from among the various point of view from which elements can be presented."[১০]

সাহিত্য মানুষের বিষয়। মানুষকে কেন্দ্র করেই তার সমস্ত কারুকার্য রচিত হয়। আখ্যান সাহিত্যেরই বিষয়। আমরা ভুলবশত বা সাধারণ হিসেবে গল্প বা উপন্যাস আখ্যানের প্রতিশব্দ হিসেবে গুলিয়ে ফেলি। উপন্যাস বা গল্প যাই বলি না কেন সবই ঘটনা কেন্দ্রীক। কোন ঘটনা নিয়েই রচিত হয় সাহিত্যের এইসব সংরূপগুলি। কিন্তু আখ্যানের সঙ্গে সংরূপগুলিকে মিশিয়ে দিলে বা মিশিয়ে ফেললে হয়ত ভুল করা হবে। উপন্যাস-এ আখ্যান থাকতে পারে, কিন্তু আখ্যান মাত্রেই উপন্যাস নয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, উপন্যাসের থিম্‌ই হল তার আখ্যান। একটি আখ্যানকে প্রকাশ করতে শব্দের, বাক্যের সাহায্য নেওয়া হয়। উপন্যাস আধার হিসেবে কাজ করে আখ্যান ধারণ করার ক্ষেত্রে। শব্দের অর্থ সম্পর্কে তার শোভনতা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমাণ, রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'আর্টের ধর্ম সুমিতি', কার্যকারণ সম্পর্ক এবং কাহিনির পরিণতি কী হবে, কোথা হবে, এগুলি আখ্যানের আধার অর্থাৎ এখানে উপন্যাস নির্মাণে প্রয়োজনীয় তা বলতেই পারি। যেমন 'রাজসিংহ' উপন্যাসের মত রোমান্স ও ইতিহাস নির্ভর উপন্যাসে লেখক মাঝে মধ্যেই রসিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন রসিকাপানওয়ালী বা মানিকলাল এদের দিয়ে রসিকতা করিয়ে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে তা উপন্যাসের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে খুব একটা বেমানান হয়নি। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের ক্ষেত্রে নানান অসঙ্গতি চোখে পড়ে। কাহিনি গত দুর্বলতা ছিল একথা আমরা বলতে সাহস পাই না কিন্তু উপন্যাসের শেষে নায়কের সন্ন্যাস গ্রহণ আখ্যানে আঘাত করে। লেখক বা author যখন কথক রূপ ছেড়ে

authority বা কর্তৃত্ব ভূমিকা পালন করে তখন আখ্যান এ ভাবেই আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ আখ্যান হল সেই বিষয় যা অনুভববেদ্য। পাঠকৃতি বা Text পাঠ করে পাঠকের মনে যে অনুভবের সঞ্চার হয় তাই আখ্যানের বিষয়। কথনের পিঠে কথন দিয়ে আখ্যান নির্মাণ করা হয়। অর্থাৎ শব্দের, বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে আখ্যান নির্মাণের ক্ষেত্রে।

আখ্যানের গঠন সংক্রান্ত যে সাধারণ আলোচনা তারই পারিভাষিক নাম আখ্যানতত্ত্ব। এটি text বা সংগঠনবাদের একটি অংশ। কিন্তু বিশ শতকে এই অংশই তার নির্দিষ্ট রূপে সম্পূর্ণ একটি আলোচনার অধ্যায় হিসেবে দেখা দিয়েছে। ভাষাতত্ত্ব থেকেও এ কিছু বৈশিষ্ট্য ও পরিভাষা পরিগ্রহণ করেছে। তবে আখ্যানতত্ত্ব মূলত কাহিনি সম্পর্কিত আলোচনার বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট গল্পের ব্যাখ্যা করা আখ্যানতত্ত্বের কাজ নয়, আখ্যানতত্ত্ব মূলত গল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দান করে। আখ্যানতত্ত্ব কাহিনি এবং প্লট এর মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে। কাহিনি বলতে বোঝায় ঘটনা যেমন ঘটে তারই কালানুক্রমিক বর্ণনা। অন্যদিকে প্লট বলতে বোঝায়, কাহিনির উপস্থাপন রীতি, কাহিনি সম্পাদন, ফ্রেমপরিবর্তন এবং একটি নির্দিষ্ট খোলসের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন। অর্থাৎ কাহিনি এবং প্লটের মূল পার্থক্য এখানেই ঘটনা যেমন ঘটেছে বা ঘটছে তার ক্রমনুযায়ী বিবরণ হল কাাহিনি। প্লটের ক্ষেত্রে এই ক্রমকে অস্বীকার করা হয়। লেখক বা কথক তার অভীপ্সা অনুযায়ী কাহিনিকে সাজান। এরজন্য 'flashback' পদ্ধতিরও আশ্রয় নিতে হয়। কাহিনির মধ্যে অবদান ধরে রাখতে পরে ঘটে যাওয়া ঘটনার উল্লেখ আগে করে কারণ পরে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ আমরা বলতেই পারি প্লট হল কাহিনি বিশেষ পরিবর্তিত রূপ, কাহিনি এবং প্লটের যে মূলগত পার্থক্য তাই আখ্যানতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হতে পারে।

কাহিনি ক্ষেত্রে কালগত ক্রম প্রধান বিষয় হিসেবে দেখা দেয়। অন্যদিকে প্লটের ক্ষেত্রে কার্যকারণ সূত্র প্রধান হিসেবে দেখা দেয়। তবে কখনও কখনও এই কালক্রম ও কার্যকারণ সূত্র মিলে মিশে যায়। তখন সুস্পষ্টভাবে তাদের পৃথক করা যায় না। তবে তাকে ব্যতিক্রম হিসেবেই আমরা ধরতে পারি। আমরা একটি উদাহরণ এর সাহায্য নিতে পারি—

'মা মারা গেলেন, তারপর বাবা মারা গেলেন এবং মা মারা গেলেন, সেই শোকে বাবা

মারা গেলেন'

প্রথম উদাহরণটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সময় বা 'কাল'কে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ এটিকে যদি আমরা কাহিনি বলি, তবে দ্বিতীয় উদাহরণটিতে কার্যকারণ সূত্র দেখানো হয়েছে। 'শোক' এখানে কার্যকারণ সূত্র। একজনের শোকে আর একজন মারা যাচ্ছে। অর্থাৎ প্লটের ধারণা অনুযায়ী এটিকে আমরা প্লট হিসেবে চিহ্নিত করতেই পারি।

প্লট সম্পর্কে কার্যকারণ সূত্রের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যেও কিছু ভাগ লক্ষ করা যায়। যখন কোনো ঘটনা কাহিনিতে বর্ণিত পরবর্তী ঘটনার কারণ হিসেবে বর্ণিত হয় তখন তাকে বলা হয় অগ্রবর্তী কার্যকারণ সূত্র। আবার ঠিক এর বিপরীত অবস্থায় দেখা যায়। ঘটনা ঘটেছে পূর্বে, কিন্তু কাহিনিতে তা স্থান পায় পরবর্তীতে। একে আমরা অগ্রবর্তী কার্যকারণসূত্র চিহ্নিত করতে পারি। 'হয়ে গেছে ওঠা হয়ে গেছে এখন আর কিছু করার নেই'।[১১] উপন্যাসে সূচনা ঘটিয়েছেন। ওটা কোনো একটা ঘটনা যা ঘটে গেছে তার কারণও আছে, সেটা করে জানতে পারছি। এখানে পশ্চাদবর্তী কার্যকারণসূত্র লক্ষ করেছি। আবার ওই ঘটনাটা কাহিনির শুরু না হলেও উপন্যাসের সূচনা ঘটিয়েছে। এটি অগ্রবর্তী কার্যকারণসূত্র হিসেবে চিহ্নিত করেত পারি। অর্থাৎ প্লট রচনা করতে গিয়ে লেখক কাহিনির বা ঘটনার ক্রমকে মানতে পারছেন না। লেখকের ক্ষেত্রে তা মেনে চলা সবসময় সম্ভবও নয়, এ ব্যাপারে লেখকের স্বাধীনতা সর্বজন স্বীকৃত।

ঘটনার প্রয়োজনেই চরিত্র থাকে, চরিত্রের কোনো স্বতন্ত্র গুরুত্ব নেই—অ্যারিস্টটলের এই মতকে মেনে নিয়ে বলতেই পারি

> "character gives us qualities, but it is in our action what we do that we are happy or the reverse. In a play accordingly the do not act in order to parlary the characters, they include the characters for the sake of the action."[১২]

সংগঠনবাদী তাত্ত্বিকেরাও বিশ শতকে দাঁড়িয়ে চরিত্রকে সেভাবে গুরুত্ব দিতে চাননি। তারাও চরিত্রকে গৌণ করেই রেখেছেন। এর কারণ হিসেবে পূর্বের বিকেন্দ্রীকরণ ধারণা এবং

পদ্ধতিগত সুবিধার দিকেই বেশি জোর দিয়েছেন। আখ্যানের সুনির্দিষ্ট আলোচনায় চরিত্রকে সেভাবে গুরুত্ব না দিয়ে ঘটনার দিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্যাকরণগতদিক থেকে আখ্যানও ভাষার ব্যাকরণের ন্যায় ক্রিয়াবদ কেন্দ্রীক হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ কাজই মুখ্য ক্রিয়া হিসেবে দেখা দিয়েছে।

আখ্যানতত্ত্বের আলোচনায় একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব রাশিয়ান ফার্মাসিস্ট ভ্লাদিমির প্রপ। তিনিও চরিত্র-এর তুলনায় 'Spheres of action' কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অ্যারিস্টটল যেকানে বলেছেন আখ্যানে চরিত্র শুধুমাত্র ঘটনার প্রকাশক মাত্র। প্রপ সেখানে সাত রকম 'Spheres of action' এর উল্লেখ করেছেন—

১। খলনায়ক (The villain)

২। দাতা (The doner provider)

৩। সাহায্যকারী (The helper)

৪। রাজরাণী (The princes and her father)

৫। প্রেরক (The Despatcher)

৬। নায়ক (The Hero)

৭। নকল নায়ক (The false hero)

খলনায়ক নায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে আবার খলনায়ক সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এইভাবে একটিই চরিত্র আখ্যানে একাধিক ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসের বিষয় ধরতে পারি। উপন্যাসের প্রথমে মানিকলাল খলনায়ক। পরবর্তীকালে নায়কের সহকারীর ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। আবার একাধিক চরিত্র একটিই ভূমিকা পালন করেছে এমন উদাহরণও আছে যেমন খলনায়ক বা খলনায়িকার ভূমিকায় একাধিক চরিত্র যেমন ঔরঙ্গজেব মবারক ও জেবউন্নিসা।

অন্যদিকে বিপরীত ভাবনারও অবকাশ রয়েই যায়

> "In fiction the charater is used as the structuring elements the objects and the events of fiction exist in one way or other because of the character and infact, it is only in relation to it that they prssess thoses quilities of coherence and plausibility which make them meaningful and comprehensible."[১৩]

কল্প আখ্যানের সংগঠনবাদী বিশ্লেষণে চরিত্রকেই গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। তাই কোনো একটিকে চরম গুরুত্ব না দিয়ে পরস্পর নিরাপদ হিসেবে বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আখ্যানে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বা সূত্র বেঁধে দেওয়া যায় না। তাই কোনো আখ্যানে কখনও চরিত্র প্রাধান্য পেয়ে যায়। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৩৬-১৯৫৬) 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬)য় চরিত্র প্রাধান্য পায় আবার বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) তে ঘটনা প্রধান হয়ে যায়। তবে এটা নির্ভর করে সম্পূর্ণ রূপেই পাঠকের ওপর। আখ্যান পর্বের সময় পাঠক যদি ঘটনাকে বেশি গুরুত্ব দেন তবে চরিত্র গৌণ হয়ে যায় আবার ঠিক উল্টো দিকে আখ্যান পাঠক যদি চরিত্রকে প্রাধান্য দেন ঘটনা তখন গৌণ হয়ে যেতে বাধ্য। তবে শুধু আখ্যান পাঠের ক্ষেত্রে নয় আখ্যানের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও এই তারতম্য লক্ষ্য করা যেতে পারে।

বিশ শতকের সমালোচনা সাহিত্যে আখ্যানতত্ত্ব একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। মূলত পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্বের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে আখ্যানতত্ত্বের আবির্ভাব। ইংরেজিতে Narratology-র বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে আখ্যানতত্ত্বের প্রচলন। আখ্যানতত্ত্বের আলোচনায় বিশ শতকের প্রবাদপ্রতীম সাহিত্য সমালোচক মিখাইল মিখায়লোভিচ বাখতিনের নাম বাদ দিয়ে কোনও আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। সমকালে 'বাখতিন ঘরানা' (Bakhtin School) নামে একটি নতুন সংস্থানের সৃষ্টি হয়। এই ঘরানার মধ্যে পড়েন বাখতিন, পাভেলা মেদভেদেভ (Pavel Medvedev) এবং ভ্যালোন্তিন ভেলোশিনোভ (Valentin Voloshinov)। এই তিন জনের সম্মিলিত আলোচনাই বাখতিন ঘরানা নামে পরিচিত।

বাখতিনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থনাম হল— Problems of Dostoyevsky's Poetics (১৯২৯), Rabelais and his world (১৯৪০), The Dialogic Imagination, Four Essays (১৯৬৫-১৯৭৫) ; Speech Genres and other Late Essays (১৯৮৭)।

প্রধানত রুশ আঙ্গিকবাদ বা সংগংনবাদের সূত্র ধরে আখ্যানতত্ত্বের আবির্ভাব। বাখতিনের প্রথমদিকে এই আঙ্গিকবাদ বা সংগঠনবাদেরই সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। তিনি আঙ্গিকবাদকে অতিশয় বিমূর্ত বিষয় হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করতেন, এইসব আলোচনায় সামাজিক প্রেক্ষিত অনেক বেশি উহ্য থেকে থাকে। তাই তাদের সমালোচনা করে তিনি ঐতিহাসিক নন্দনতত্ত্বের প্রস্তাব দেন। সেখানে তিনি শব্দের মাধ্যমে ভাবের সঞ্চার ও আন্তঃক্রিয়া দুটি শব্দের ওপর জোর দিয়েছেন। সমাজ প্রত্যাখ্যাত কিছুই হয় না। সমস্ত সামাজিক ভাব বিনিময় হয় শব্দের মাধ্যমেই এবং একটি আন্তঃক্রিয়া সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকে। ফিওডোর দস্তয়েভস্কির (Fyodor Dostoyevsky, 1821-1881) একজন রুশ সাহিত্যিক। তাঁর উপন্যাসের নন্দনতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে বাখতিন দ্বিবাচনিকতা ও বহুস্বরিকতার কথা বলেছেন। 'From the prehistory of Noretistic Discourse (1967) প্রবন্ধে উপন্যাসের ভাষা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন—

> "The author participates in the novel (he is omnipresent in it) with almost no direct language of his own. The Language;"[১৪]

বাখতিন উপন্যাসে 'স্বর'-এর কথা বলেছেন। কোন কোন উপন্যাসে একক স্বর ও বহুস্বরের কথাও বলেছেন। দস্তয়েভস্কির উপন্যাস বিশ্লেষণ করে বাখতিন দেখিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে শেষে বলে কিছু নেই। সেখানে অনবরত দ্বিরালাপ চলতে থাকে। যার ফলে কোনও স্বর প্রধান বা মুখ্য বলে চিহ্নিত করা যায় না। এখানে কেন্দ্রীয় স্বর বলে কিছু নেই। সকলের স্বরই এখানে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পাবার আশা রাখে। তাই আমরা বলতেই পারি, দস্তয়েভস্কির উপন্যাস দ্বিবাচনিক বা Diologic. দ্বিবাচনিকতা বলতে বোঝায় কোনও রচনায়

চরিত্রগুলি তাদের নিজেদের সঙ্গেই নিজেরা নিরন্তর আলাপে মগ্ন থাকে, বা নিজের আদর্শের সঙ্গেই সর্বদা, দ্বিরালাপ চালাতে থাকে, অন্য অন্য কোনও চরিত্রের সঙ্গেও এই একই ক্রিয়া চলতে পারে। এইভাবে কোনও চরিত্রই প্রধান হয়ে না উঠে একের সাপেক্ষে অপর প্রধান হয়ে ওঠে। সত্তার এই জটিল প্রক্রিয়াকেই বলা হয় দ্বিবাচানিকতা।

অন্যদিকে লিও টলস্টয়ের উপন্যাসে এর বিপরীত ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। বাখতিন তাঁর উপন্যাস বিশ্লেষণ করে বিপরীত বৈশিষ্টই খুঁজে পেয়েছেন। এখানে কোনও না কোনও চরিত্রের স্বরই প্রধান হয়ে উঠেছে। এই প্রধান স্বরই মূল কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। টলস্টয়ের উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি আমাদের জানিয়েছেন। এখানে পাঠক চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কোনও একটি চরিত্রে পাঠক নিজেকে সম্পৃক্ত করে তুলতে পারে।

বাখতিনের 'The Dialogic Imagination' (1981) প্রবন্ধে উপন্যাসের দ্বিবাচনিকতা সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন তা বাংলা উপন্যাসের আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। বাংলার এক যুগান্তকারী লেখক সতীনাথ ভাদুড়ির অনন্যসাধারণ রচনা 'জাগরী' উপন্যাসে এই দ্বিবাচনিকতার বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাবো। এখানে চারটি অধ্যায় চারটি চরিত্রের সব চরিত্রই নিজের মতো করে মনের কথা বলেছে। সামনাসামনি দুটি চরিত্র কখনও মুখোমুখি না হয়েও একে অপরের সঙ্গে বাক্যালাপ করে চলেছে। একই জেলে একই পরিবারের চারজন বন্দী, একজনের ফাঁসিকে কেন্দ্র করে সমস্ত ঘটনা, ভাবনা, ক্রিয়াকলাপ অনবরত ঘটে চলেছে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সার্থক দ্বিবাচনিক উপন্যাস হিসেবে 'জাগরী' উপন্যাস এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বাখতিন উপন্যাসের আলোচনায় যে স্বরের কথা বলেছেন তা শুধুমাত্র কণ্ঠস্বর বোঝাতেই ব্যবহার করেননি। তিনি স্বর বলতে বুঝিয়েছেন সেই চরিত্রের রুচি, বিশ্বাস, বোধ, সমাজ প্রেক্ষিত, সামাজিক আধিপত্য। আমরা 'জাগরী' উপন্যাসের বহুবাচনিকতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এটি একদিক থেকে বহুস্বরিকও বটে। সতীনাথ ভাদুড়ি যে চারটি চরিত্রের কথা চারটি অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন তারা হল বিলু, নীলু ও তাদের বাবা-মা। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে

এক একজন তাদের নিজের চিন্তা, চেতনা, ভাবনা, জীবনবোধ সামাজিক অভিরুচি অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। এখানে যেটা উল্লেখযোগ্য তা হল প্রত্যেকটি চরিত্রের কথা পৃথক পৃথক সত্ত্বায় প্রতিভাত হয়েছে। কোন স্বর কোন স্বরের সঙ্গে মিশে কেন্দ্রীয় স্বর সৃষ্টি করেনি। প্রত্যেকের স্বরই সমান মর্যানায়, সমান গুরুত্ব সহকারে নিজস্বতায় ভাস্বর হয়ে উঠেচে। এ দিক থেকে বলতে পারি বাখতিন কথিত দ্বিবাচনিক ও বহুস্বর উভয় বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাই।

বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বে আর একজনের নাম করতেই হয়। তিনি মূলত সংগঠনবাদ ও উত্তর সংগঠবাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে আখ্যানতত্ত্বের এক নতুন দিশা দেখিয়েছেন। তাই বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের আলোচনায় রলা বার্ত একটি উল্লেখযোগ্য নাম। আখানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন —

> "A discourse is a long 'sentence' (the unit of which are not nessarity sentences), just as a sentence, allowing for certain specifications, is a short 'discourse'"[১৫]

বার্ত function ও Index কে আখ্যানের মৌল একক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। Function বলতে তিনি কার্যবন্ধন এবং Index বলতে চরিত্র সম্পর্কে তথ্য একত্রিকরণকে বুঝিয়েছেন।

আখ্যানতত্ত্ব সম্পর্কে সমালোচকদের মধ্যে বারে বারে মতভেদ দেখা দিয়েছে। অনেকে মনে করেন আখ্যানের আলোচনা করাই আখ্যানতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। তবে আখ্যান ঠিক কী? কাকে আখ্যান বলব, আখ্যান কখন আখ্যান হয়ে ওঠে এই সব একাধিক বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আখ্যান শুধুমাত্র পরিণাম না এটি একটি প্রক্রিয়া এই বিষয়েও তাঁরা একমত হতে পারেননি। কেউ কেউ আখানকে একটি পরিণাম হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। আবার অনেকে এটিকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে স্বীকৃতি দিতে চান। সুজান ল্যান্সোর (Susan Lanser) 'Toward a feminist Narratology (1986) প্রবন্ধে এই মতের প্রতিষ্ঠায় নারীবাদী আখ্যানতত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। আবার অন্য একটি যুক্তিতে আখ্যানকে ঘটনা প্রধান হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থ এখানে সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে

না। অন্যদিকে বিপরীতপন্থীরা অর্থকে প্রধান করে ঘটনাকে গৌণ করে দেখাতে চেয়েছেন। তারা মনে করেন অর্থের প্রয়োজনেই ঘটনার উপস্থাপনা। আখ্যানকে কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় বদ্ধ করতে আজ পর্যন্ত সমালোচকেরা একমত হতে পারেননি। কোনও একটি সংজ্ঞা দিয়ে আখ্যানকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভবপর হয়নি। আখ্যানকে নির্দিষ্ট রূপে চিহ্নিত করাও যায় না। তার কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে তাকে আমরা আমাদের থেকে আলাদা করে তুলতে পারি। আখ্যানে বিষয় এবং উপস্থাপন কৌশল নিয়ে তাত্ত্বিকরা নানা মত ব্যক্ত করেছেন। আখ্যানের সাধারণ ধারণায় আমরা জানতে পারি, আখ্যানে এক বা একাধিক কথক থাকবে যাকে আমরা ইংরেজিতে Narrator নামে চিহ্নিত করতে পারি। এক বা একাধিক আখ্যান গ্রাহক থাকবে যাকে আমরা Narratee নামে চিহ্নিত করতে পারি। আর একটি উপাদান থাকবেই তা হল এক বা একাধিক বাস্তব বা কাল্পনিক ঘটনা। এই ঘটনার পুনরায় বর্ণনাকেই আখ্যান নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তা হলে প্রশ্ন উঠতেই পারে, নাটকও কী আখ্যান। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি না, নাটক আখ্যান হিসাবে পরিগণিত হবে না। কারণ আখ্যানকে আমরা পূর্বেই অতীত ক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করেছি। আর নাটকে সমস্ত ক্রিয়াই বর্তমানকালে ঘটে। তাই নাটককে আখ্যানের পর্যায়ভুক্ত করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সমালোচক টোডোরভ এবং গ্রিমাস আখ্যানের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেন, শুধু দুটি ঘটনাই আখ্যানের মুখ্য বিষয় নয় ; সেই ঘটনা দুটিকে কার্যকারণ সূত্রে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। ঘটনাগুলি কোনও কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ হলে তবেই ঘটনাগুলি আখ্যানে পর্যবসিত হবে। সংগঠনবাদীরা আবার আখ্যানকে দুটি নির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। একটির নাম দিয়েছেন 'কাহিনি' এবং অন্যটি 'সন্দর্ভ'। এখানে কাহিনি বলতে ঘটনার কালাণুক্রমিক বর্ণনা। আর 'সন্দর্ভ' বলতে কাহিনির পরিবেশিত রূপকে চিহ্নিত করেছেন। এটি একটি কৌশলও বলতে পারি। কাহিনি এবং সন্দর্ভ মিলেমিশে, মিথক্রিয়ার মাধ্যমে আখ্যানের রূপ লাভ করে।

আখ্যান মাধ্যম নিরপেক্ষ একটি সংরূপ। আখ্যানের প্রকাশ এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে সঞ্চলিত হতে পারে। আখ্যানত্ব নামের আখ্যান বৈশিষ্ট্যের জন্যই আখ্যান মাধ্যম নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ লাভ করে। মাধ্যমের পরিবর্তনে আখানেরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

কোনও একটি উপন্যাসে আখ্যান যে মাত্রায় যে সময়ে বর্ণিত হয় চলচিত্রে রূপায়ণের পর সেই একই আখ্যান সম্পূর্ণ অন্য রূপ লাভ করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসের Text এবং চলচিত্র পাশাপাশি রাখলে এর ভেদ আমরা সহজেই নির্ণয় করতে পারব। Text-এ যে ঘটনার বর্ণনা পাতার পর পাতা লেগে যায়, চলচিত্রে তাই একটি মাত্র দৃশ্যে বোঝানো হয়। সময়, কাহিনি এবং পাঠকৃতি দুটির ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে। কাহিনি বলতে এখানে Story কে বোঝানো হয়েছে। কোনও ঘটনা যখন ঘটে তার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। এই সময় মূর্ত সময়। পাঠকৃতিতে এই সময়কে ধরা যায় না। আখ্যান উপস্থাপনের মাধ্যম হল ভাষা আর আখ্যানের অন্যতম বিষয় হল কাহিনি। আখ্যানের ভাষা এবং বিষয় সময়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। রিমন কেনান সময় সম্পর্কে তার মূল্যবান বক্তব্য দিয়েছেন—

> "Thus time in narrative fiction can be defind as the relations of chronology between story and text" [১৬]

কাহিনি এবং পাঠকৃতির মধ্যে সময়ের পার্থক্য বিদ্যমান। কাহিনি হল ঘটে যাওয়া ঘটনা। আর পাঠকৃতি হল সেই ঘটে যাওয়া ঘটনার পুনঃকথন। কাহিনির ক্ষেত্রে সময়কে নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা যায়। একটি নির্দিষ্ট ক্রমে ঘটনার ঘটে যাওয়াই কাহিনি পদবাচ্য। কাহিনির ক্ষেত্রে ঘটনা ক্রমানুসারে ঘটবেই। বাস্তবে ঘটনা ক্রমানুযায়ীই ঘটে। সেই ঘটনাই যখন পাঠকৃতিতে রূপ পায় তখন তার সেই ক্রম রক্ষা করা সবসময় সম্ভবপর হয় না। লেখক বা নির্মাণকার যখন কোনও ঘটনাকে পাঠকৃতিতে স্থান দেন তখন সময়ের হেরফের ঘটে যায়। পরের ঘটনা আগে এবং আগের ঘটনা পরে চলে যেতেই পারে। আখ্যানে কাহিনির এই সজ্জা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন ঘটনা কখন দেখিয়ে একটা রহস্য সৃষ্টি করা যাবে তা সম্পূর্ণ লেখকের নিজস্ব ব্যাপার।

একদিকে, কাহিনি যেমন বিমূর্ত বিষয়, অপরদিকে পাঠকৃতি বা Text হল মূর্ত বিষয়। পাঠক পাঠকৃতিকে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করতে পারেন। লেখক কাহিনি বিষয়কে বর্ণনা করার জন্য কতকগুলি চরিত্র নির্মাণ করেন। চরিত্রগুলি কাহিনিতে তাদের নিজস্ব ভূমিকা পালন করে।

চরিত্র আবার একাধিক রকমের হতে পারে। একমুখি চরিত্র, এ ক্ষেত্রে চরিত্র কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একইভাবে, তার বিশ্বাস, সংস্কার, চিন্তা, চেতনা নিয়ে এগিয়ে চলে। সময় তার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না। পরিস্থিতি যাই আসুক না কেন চরিত্রের চরিত্রগত কোনও পরিবর্তন হয় না। এ ক্ষেত্রে চরিত্র খুব যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। পাঠক তাকে ঠিক মেনে নিতেও পারে না। আবার এক রকমের চরিত্রও আছে যারা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে কখনও নিজের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে দ্বন্দ্ব, আবার কখনও কাহিনির অন্য চরিত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নিজেকে গড়ে তোলে। আখ্যান রচনার ক্ষেত্রে উপরি উল্লিখিত দ্বিতীয় ধরণের চরিত্রই উপযুক্ত। আবার কোনও কোনও কাহিনিতে দু ধরনের চরিত্রই সমান গুরুত্ব সহকারে নিজেদের প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত থাকে, কেউ কাউকে ছাপিয়ে যায় না বা কেউ কাউকে অবদমিত করে রাখতে পারে না।

আমরা সাধারণভাবে লজ্জা নিবারণের জন্য পোশাকের ব্যবহার করে থাকি। সাজ-সজ্জার ব্যাপারটি আমাদের অলংকরণের মধ্যেই পড়ে। বাস্তবে যেমন চেহারা এবং সাজপোশাকের সামঞ্জস্য আশা করি, আখ্যানের ক্ষেত্রেও চরিত্রের চোহারার সঙ্গে তার সাজপোশাকের সামঞ্জস্য বিধান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জার্মান দার্শনিক লাভাতের চরিত্রবিদ্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর 'Physionomische fragmente' প্রবন্ধে এ ব্যাপারে মতামত দিয়েছেন। সেখানে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেও ব্যক্তির চেহারা এবং তার সাজপোশাক অত্যন্ত সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এই বিষয়টি বর্তমান সময়েও খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি। বর্তমান লেখকেরা চরিত্র সৃষ্টির সময় সচেতন-অসচেতন উপায়ে চরিত্রের সাজপোশকের দিকে নজর দিয়েই থাকেন না। ব্যক্তির গঠনগত দুটি দিক আছে— একটি তার জন্মগত। অর্থাৎ ব্যক্তি যা নিয়েই জন্মায়। তার মধ্যে পড়ে ব্যক্তির গায়ের রং, তার উচ্চতা, ইত্যাদি। যদিও বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে এরও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হচ্ছে। অন্য একটি দিক হল ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্যক্তি কী পোশাক পরবে, কী রঙের পড়বে, পরিচ্ছদের ধরণ কেমন হবে, তার চুলের রং কেমন হবে, আঁচড়ানোর ধরণ কেমন হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে— শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুনপোকা' উপন্যাসে চাকরি খেয়ানো শ্যাম-এর চেহারার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন এইভাবে—

> ‘‘মিত্রের এঁটো ডানহাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে এসেছিল। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঘেন্নায় লাফিয়ে উঠল শ্যাম, বলল, দেখব। তারপর আঁচাতে গিয়ে বেসিনের ওপর আয়নায় নিজের মুখখানা এক পলকে দেখে নিল সে ঞ্ব তেলতেল করছে তার মুখ, অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ি, অনেক দিন তেল বা শ্যাম্পু না দেওয়া রুক্ষ চুলে তাকে পাগলাটে দেখায়। হাত আয়নায় রোজ সে মুখ দেখে, কিন্তু এই বড় আয়নায় তাকে অন্যরকম দেখায়। তার মনে হয়, তার দু’চোখে এক ধরনের পরিবর্তন এসে যাচ্ছে।’’[১৭]

শ্যামের পরিস্তিতি গত চেহারার যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তা শ্যামের নিজস্ব সৃষ্ট। তার অবস্থার কথা বলতে লেখক এইরকম একটি সাজের কথাই বলেছেন। যদি শ্যামের গালভরা দাড়ির পরিবর্তে পরিস্কার পরিপাটি মুখের কথা বলা হত তা হলে পাঠক হয়ত এত সহজে শ্যামের পরিস্থিতি অনুভব করতে পারতেন না। শ্যামের নিজের প্রতি অমনোযোগী সে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা ঠিক বোঝানো যেত বলে মনে হয় না।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অন্য আর একটি উপন্যাস দিন যায় (১৯৭৪)। সেখানে সমীর রায় নামের একটি চরিত্রের আভিজাত্য, তার সুখি জীবনযাপন ইত্যাদি বিষয়গুলি বোঝাতে কিছুটা উদ্ধৃতির সাহায্য নিতে পারি

> ‘‘সামনে প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তার ওধারে সমীর। মনোরমের ভায়রাভাই। কিংবা ভূতপূর্ব ভায়রাভাই। লম্বা চেহারায় এখন একটু মেদ জমেছে। রংটা কালোই ছিল এখন ইট-চাপা ঘাসের মতো ফরসা হয়েছে। ভালো খায়-দায়, গাড়ি চড়ে বেড়ায়, গায়ে তালায় রোদ লাগে না। সরু টাই, চেয়ারের পিছনে কোট ঝুলছে। ঝুঁকে একটা কাগজ দেখছিল সমীর। চমৎকার এখজোড়া মদরঙের ফ্রেমের চশমার লপর ওর বড়ো কপাল লালচে চুল টিকালো নাম এবং গভীর খাঁজওলা থুতনিতে আভিজাত্য ফুটে আছে। সেই মুখশ্রীতে ওর চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সটা ধরা যায় না। অনেক কম বলে মনে হয়।’’[১৮]

এখানে সমীরের দু ধরনের বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাওয়া যায়। তার সাজপোশাকের আভিজাত্য যেমন পাই তেমনই তার জন্মগত পরিচয়ও সামনে আসে। লম্বা চেহারা, কালো গায়ের রং, বর্তমানে পরিবর্তন হয়েছে। বড় কপাল, টিকালো নাক। আবার ঠিক এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সরু টাই, চেয়ারের পিছনে ঝোলানো কোট, দামি ফ্রেমের চশমা, লাল রঙের চুল এ সবই আভিজাত্য প্রকাশ করার সরঞ্জাম। সমীরকে যদি পূর্বে উল্লিখিত শ্যামের সাজ পোশাকে সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসানো হত তা হলে পাঠকের কাছে তা হয় খুব একটা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠত না।

আখ্যান নির্মাণে পরিবেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবেশ অনুযায়ী চরিত্র, কাহিনি নির্মিত হয়। মূলত দু ধরনের পরিবেশ-এর কথা আমরা বলতে পারি। একটি হল জড় পরিবেশ, অন্যটি হল জীব পরিবেশ। জড় পরিবেশের মধ্যে পড়ে গ্রাম, শহর, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ইত্যাদি। জীব পরিবেশের মধ্যে পড়ে সমাজজীবন, পরিবার পরিজন ইত্যাদি। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের কথাই আখ্যানে উচ্চারিত হয়। মানুষকে কেন্দ্র করে জড় ও জীব দুই ধরনের পরিবেশই নিয়মিত ঘুরপাক খায়। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলি মানুষের অবস্থান বোঝাতে খুবই সহায়ক উপকরণ হিসাবে কাজ করে। পরিবেশ ও সাজপোশাকের মতোই চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়।

উপন্যাসের আলোচনায় পরিবেশ কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাতে পারি—

> ''শ্বেত পাথরের প্রাচীন এবং রাজসিক সিঁড়ি। বহুকাল ধরে পায়ে পায়ে ক্ষয়ে গিয়ে ধাপগুলো নৌকোর খোলের মতো দেবে গেছে একটু। তবু সুন্দর দোতলার মেঝেতে পা দিলে মেঝেতে পারসিক কার্পেটের সূক্ষ্ম এবং রঙিন সুতোর মতো কারুকাজ দেখা যায়। কোথাও কোথাও ফাটল ধরেছে, তবু তেলতেল করছে পরিস্কার, মোটাদেওয়ালের মাঝখানে নিঃশব্দ করিডোর, তাতে বদ্ধ-বাতাসের গন্ধ। অফিসবাড়িটায় পা দিলেই একটা 'গুডউইলের' অলক্ষ্য অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। গুডউইল। বিশ্বস্ততা এবং

সুনাম। একটা বড় হলঘরের একধারে টিকপ্লাইয়ে ঘেরা চেম্বার। সেখানে সমীর রায় বসে। সামনে প্রকাণ্ড সেক্রেটরিয়েট টেবিল। তার ওধারে সমীর।"[১৯]

এইভাবে সমীর রায়ের অবস্থার কথা পারিপার্শ্বিক বর্ণনার মাধ্যমে খুব সহজেই ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

কাহিনি বিষয়ে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। অ্যারিস্টটলের কাহিনি ভাবনার কথাও আলোচনা করা হয়েছে। তবে মূলত কাহিনি বলতে প্রথমেই যা আমাদে মনে আসে তা হল গল্প। আর এই গল্প বলতে ঘটনার পুনঃকথন। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের আলোচনায় কাহিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে উপন্যাসের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার আছে। সেই অনুযায়ী কাহিনি গুরুত্ব পায়। ঐতিহাসিক, রোমান্টিক, ডিটেকটিভধর্মী উপন্যাসে কাহিনি যেমন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, তেমনই আবার চেতনাপ্রবাহ মূলক উপন্যাসে কাহিনি গৌণ হয়ে যায়। সেখানে চেতনার প্রকাশই প্রধান হয়ে ওঠে। আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা জানি, অঞ্চল বা স্থানের প্রাধান্য, ঠিক তেমনই চরিত্র নির্মাণ প্রাধান্য পায় মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে।

আখ্যানে তিনটি প্রধান উপাদান হল কথক, কথন এবং পাঠক বা শ্রোতা। কারণ আখান লিখিত বা শ্রুত দুই মাধ্যমেই বর্ণনা করা যেতে পারে। আখ্যানে একজন বা একাধিক কথক থাকবেই, যার মুখ দিয়েই কাহিনি বর্ণিত হবে। কথন বা কথাবস্তু বিষয় যা কথকের জবানীতে উচ্চারিত হয় ; পাঠক বা শ্রোতা সেই কথাবস্তু বা কথন পাঠকের বা শুনে অনন্ত ও জ্ঞান উভয়ই লাভ করতে পারে। আখ্যানে দু ধরনের কথন উপস্থাপিত হতে পারে। একপক্ষ প্রত্যক্ষ বচন বা Direct Speech এবং পরোক্ষ রচনা বা Indirect Speech। কথন সব ক্ষেত্রেই পরোক্ষ উক্তিতেই হয়। আখ্যানের ক্ষেত্রে আমরা এই পরোক্ষ উক্তিই লক্ষ্য করি। আখ্যান কাহিনি উপাদান ভিত্তিক কাহিনি যেহেতু পুনঃকথন তাই আখ্যানের ক্ষেত্রে পরোক্ষ উক্তি লক্ষ্য করা যাবে এটাই খুব স্বাভাবিক বিষয়।

আখ্যানে কথনের বিভিন্ন ধরন লক্ষ্য করা যায়, একটি প্রকার হল ভূমিকা বা চরিত্র অনুযায়ী কথন। ভূমিকা বা চরিত্র সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার কথন হল কাহিনির

বাইরে থেকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে বিবরণ দিয়ে যাওয়া। অন্য আর একটি প্রকার হল উত্তম পুরুষে। আখ্যানের কোনও চরিত্র যখন কথকের ভূমিকা নিয়ে কথন পরিস্থিতি নির্দিষ্ট করেন তখন এক ধরনের কথন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

কথা সাহিত্যের সমস্ত প্রকরণেই কথন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আখ্যানের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম আমরা দেখি না। আখ্যানও মূলত কথন ভিত্তিক। নাটকের ক্ষেত্রেও কথন থাকে তবে তা মূলত সংলাপ আশ্রয়ী। তার সঙ্গে তার আরও কিছু অনুষঙ্গ থাকে। সবটাই দর্শক নিজে প্রত্যক্ষ করে তার রস উপভোগ করে। এ ক্ষেত্রে থাকে মূলত দর্শক। আখ্যানের ক্ষেত্রেই সেই সুযোগ নেই। এখানে দর্শকের পরিবর্তে থাকে পাঠক বা শ্রোতা। আখ্যান কথক তাঁর চোখ দিয়ে কোনও বিষয়কে দেখে সেই Point of view থেকেই পাঠক বা শ্রোতাকে দেখাতে চান। নির্মাতা যখন কোনও আখ্যান নির্মাণ করেন তখন কল্প-পাঠক তৈরি করে নেন। সেই অনুযায়ীই আখ্যান নির্মাণ করেন। সুতরাং এখানে কথক সমস্ত কথাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এ প্রসঙ্গে stanzel তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন—

> "Narration can be considered to be effected by two kinds of narrative agents narrator (in a personalized or unpersanalized rale) and reflection of the narrative froms between the two poles narrator and reflector."[২০]

এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কথন কেমন হবে তা নির্ভর করে নিরীক্ষণের ওপর। কার নিরীক্ষণের ওপর ভিত্তি করে কথন বর্ণনা করা হচ্ছে তার ওপর কথন বিষয় নির্ভর করে। মূলত দু ধরনের কথন রীতি প্রচলিত আছে। প্রথমত কাহিনির কোনও চরিত্র যদি কথকের ভূমিকা গ্রহণ করে, দ্বিতীয়ত কাহিনির বাইরে কোন কথক যদি শুধুমাত্র তার নিরীক্ষণকে বর্ণনা করেন। প্রথম প্রকার কথন রীতিকে আমরা 'আত্মকথন রীতি' নামে পরিচয় দিতে পারি অন্যদিকে দ্বিতীয় প্রকার কথনকে 'ভূমিকানুগ' কথন হিসাবে মান্যতা দিতে পারি। আখ্যান কথনে কার দৃষ্টিকোণ বা Point of View ব্যবহার করা হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিষয় এবং লেখকের ইচ্ছার ওপর। এ প্রসঙ্গে সমালোচক Dorothy van Ghent-এর মন্তব্য স্মরণ করতে পারি,

> "The technical probles with which we are confornted here is that of the 'Point of view or focus of narration', a probelem which may be phrased thus : given a creatin kind of subject matter, how can it be braught into focus for the reader? from what "angle", what point of observation can the drama best seen? from the author's own? or from that of the chief character of the nvovel? or from that of one of the minor character? or from the point of view of several characters? or fron some presumably automatic amd mechanical point of view clike that of a camera ?"[২১]

বয়ান উপস্থাপনের নিরীক্ষণেরও বিভিন্ন প্রেক্ষিত লক্ষ্য করা যায়। লেখক বয়ানকে কার নিরীক্ষণে পাঠকের সামনে উপস্থিত করবেন তারও কয়েকটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। একপ্রকার নিরীক্ষক আছে যারা বয়ানের বাইরে থেকে নিরীক্ষণ করেন এবং কাহিনির বর্ণনা দেন। এ ক্ষেত্রে নিরীক্ষক এবং কথক এক হয়ে যায়। কথক বাইরে থেকে সমস্ত ঘটনা পরম্পরা, চরিত্র ইত্যাদিকে তাঁর দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করেন এবং পাঠককে তাঁর অভিজ্ঞতার কথাই পাঠকৃতিতে বলেন। বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগে লেখক বা নির্মাণকার এই রীতিরই মূলত আশ্রয় নিয়েছেন যেমন দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, চোখের বালি, গৃহদাহ ইত্যাদি। অন্য আর এক রকমের বয়ানও আমরা লক্ষ্য করে থাকি। সেখানে নিরীক্ষণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। সে ক্ষেত্রে কাহিনির মধ্যেকার কোনও এক বা একাধিক চরিত্র তাদের নিরীক্ষণে বয়ান উপস্থাপন করেন। এ ক্ষেত্রে একাধিক কথকও লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা কাহিনির কোন চরিত্রের ভূমিকাও পালন করেন আবার কথকের ভূমিকাও পালন করেন। কাহিনির একটি চরিত্রই সম্পূর্ণ বয়ানের কথক, এরকম উপন্যাসের উদাহরণ- 'চতুরঙ্গ', 'শ্রীকান্ত' ইত্যাদি। আবার একাধিক চরিত্রের মুখে একটিই বয়ান বর্ণিত হয়ে এরকম উদাহরণও আছে যেমন— 'ঘরে বাইরে', 'জাগরী'

ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে জটিলতা অনেক বেশি। প্রথম প্রকার নিরীক্ষণে লেখক প্রত্যক্ষভাবে কাহিনির মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে লেখক পরোক্ষে প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু সরাসরি তাঁর স্বর আমাদের কানে আসে না। চরিত্র বা কথকই তখন বয়ান নির্মাণকার হয়ে যান। এই ধরনের পাঠকৃতি বা Text পাঠ করার সময় পাঠকের মনে লেখক বিস্তৃত হয়ে যান। কথকের সঙ্গেই পাঠকের দ্বিরালাপ চলতে থাকে।

উপন্যাসের ধারণা বহু প্রাচীন। ইংরেজি Novel-এর হাত ধরে আমরা বাংলা উপন্যাস পাই। উপন্যাসের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট আমাদের বহু পরিচিত। বহু চর্চিত একটি বিষয় তাতে অনেক চরিত্রের ঘনঘটা, বিস্তৃত কাহিনি। তাতে একটি আদি মধ্যে অন্ত-র ধারণা আছে। কাহিনি শুরু হয়ে তা পল্লবিত হতে হতে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে মূল কথা ছিল একটা গল্প বলা, গল্প বলারও বিভিন্ন ধরণ আছে। সেই অনুযায়ী উপন্যাস বিভিন্ন ধরণে প্রকরণে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। ইতিহাস আশ্রিত কাহিনি অবলম্বনে উপন্যাস, সামাজিক কোনও কাহিনি নির্ভর উপন্যাস, রোমান্সধর্মী উপন্যাস ইত্যাদি একাধিক প্রকার আছে। এতদিন তাই চলেও আসছিল এবং পাঠক তা পাঠ করে আনন্দ উপভোগও করেছিল। পূর্বে উপন্যাস নামক প্রকরণের প্রধান দায়ই ছিল আনন্দ দান করা।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে আমরা 'আখ্যান' নামের একটি প্রকরণের কথা জানতে পারি। এটিও ইংরেজি Narratology নামক ধারণার থেকেই বাংলায় আখানতত্ত্ব নাম দিয়ে গ্রহণ করেছি। পূর্বে উপন্যাসের যে ধারণা ছিল তা বড়ই একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছিল। আমরা নতুন কিছু পেতে চাইছি। তার থেকেই আখ্যানের আলোচনার সূত্রপাত। আখ্যান কোনও আলাদা বিষয় হিসাবে নয় উপন্যাস আলোচনার একটা ভাগ হিসেবে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ হয়ে উঠেছে। আধুনিক সময়ে উপন্যাসকে 'Fiction' বা কল্প কাহিনি হিসাবেও আমরা পেয়েছি। অর্থাৎ শুধু বাস্তব নয়, বাস্তব ও কল্পনার সুসম মেলবন্ধনই উপন্যাস হয়ে উঠেছে। একটি উপন্যাস কখন আখ্যান হয়ে উঠবে তারও কিছু নির্দিষ্ট বৈবশিষ্ট থাকবেই। যেহেতু Narratology থেকেই বাংলায় আখ্যানের ধারণা তাই Narrate বা বর্ণনা দেওয়া একটি বৈশিষ্ট্য। তবে শুধু বর্ণনা দিলেই তো আর হয় না। বর্ণনাকে বর্ণন করারও কিছু রীতি

আছে। বর্ণনা করতে গেলে যার সাহায্য সবচেয়ে প্রয়োজন তা হল ভাষা। ভাষার সাহিত্যই কথা সাহিত্য। লেখক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতটা যত্নশীল, কতটা আধুনিক, কতটা সময়োচিত এবং বিষয় ও চরিত্র নির্ভর তার বিশ্লেষণ আখ্যানে গুরুত্ব পায়। উপন্যাসের যেমন একটা শেষ আছে আখানে চলাই প্রাধান্য। মানুষের কথাই আখ্যানে প্রধান স্থান নির্ণয় করে। সব নির্মাতাই তার সময়কে ধরতে চান। আর এই সময়কে কতটা গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেন, পাঠকের মনে প্রভাব বিস্তার করে, পাঠক বর্তমানে আনন্দের বদলে ভাবতে চায়। সেই ভাবনা কোনও লেখক কতটা তার বয়ানে উপস্থিত করতে পারেন ততই তিনি আখ্যানের দিকে অগ্রসর হন। দুটোর নির্যাস হিসাবে ক্ষীর আমরা পেয়ে থাকি। আমাদের আলোচনায় উপন্যাস হল দুধ এবং তার নির্যাসকে আখ্যান অভিধায় ভূষিত করতে পারি। অর্থাৎ উপন্যাসের মূল বিষয়কে আখ্যান বলতে পারি। অর্থাৎ উপন্যাসের বা Text এর একটি উপাদান হিসাবে আখ্যান হাজির হয়। তাই আখ্যানকে আলাদা করে আলোচনা করতে গেলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোনও বয়ান বা পাঠকৃতি কতটা আখ্যান হয়ে উঠতে পেরেছে বা অন্যদিকে কতটা পারেনি তার আলোচনা আমরা আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে নির্বাচিত বয়ানের বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারি।

আমরা উপন্যাসের একটি অঙ্গ হিসেবে আখ্যানকে আলোচনার বিষয়বস্তু করেছি। উপন্যাসের মধ্যে আখ্যান কতটা মাত্রায় উপস্থিত তা বোঝার জন্য আখ্যানতত্ত্বের সাহায্য নিয়ে দেখানোর চেষ্টা করবো আখ্যানত্ব কতটা রক্ষিত হয়েছে বা কতটা রক্ষিত হয়নি। আখ্যান তা হলে আমরা কাকে বলব? বিশ শতকে মূলত পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্বের হাত ধরে একটি সম্পূর্ণ নতুন তত্ত্বপ্রস্থানের জন্ম হয়। যার বিস্তৃতিও এই বিশ শতক জুড়েই। তাকে আমরা আখ্যানতত্ত্ব নামে চিনি ও জানি। কিন্তু তত্ত্ব প্রস্থানটিকে কোনও নির্দিষ্ট রূপে বাঁধা আজও সম্ভব হয়নি। মূলত ভাষার সংগঠনের সূত্র ধরে আখ্যান সংগঠনের আলোচনা করা হয়। তবে একাধিক মতামত আখ্যানতত্ত্ব ও আখ্যান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রচলিত আছে। তবে কোনও তাত্ত্বিকই একে নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় বদ্ধ করে দিতে পারেনি। আর পারেননি বলেই এটি আজও জীবিত। বারে বারে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। আমরা খুঁজে ফিরছি আখ্যানের নতুন দিকগুলি। একঘেয়েমি মুঝে ফেলে আমরা নতুনের দিকে অগ্রসর হতে চাইছি। কথাসাহিত্যের সমস্ত বয়ানকারের মূল

উদ্দেশ্য একটাই 'গল্প বলা'। কিন্তু যেহেতু সময় বদলেছে, সমাজ বদলেছে মানুষের মানসিকতা বদলেছে সেইসব কারণে মানুষ অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। বিরাট আকারের গল্প পড়ার সময় যেমন নেই তেমনই পাঠক সমাজও ভাবতে বসেছেন কেন পড়ব? এই ভাবনা মাথায় রেখেই লেখক বা নির্মাতাগন গল্পের ধরণ পাল্টেছেন, বিষয় পাল্টেছেন। পাঠের পর পাঠক যেন ভাবতে বসেন কী পেলাম। জটিল মানসিকতা জটিল সমাজের মানুষের মনও সহজ সাদাসিধা গল্প পড়ে অমূল্য সময় নষ্ট করতে চান না। তার থেকেই নতুন ভাবনার সূচনা। আর আমরা সকলেই নতুনের আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষমান। এর থেকেই 'আখ্যান' ভাবনার সূত্রপাত। আর আখ্যান সম্পর্কিত আলোচনার জন্য যে তত্ত্ব তারই নাম আখ্যানতত্ত্ব বা Narratology. আখ্যানের গঠন-বৈশিষ্ট্য তার সীমা-পরিসীমা, কাহিনি ইত্যাদি সমস্ত কিছুই তার আলোচনার মধ্যে চলে আসে। মূলত পূর্বের উপন্যাসের ধারণা কতটা আধুনিক হয়ে উঠতে পেরেছে, কতটা সময়োচিত হয়ে উঠেছে এই সব একাধিক বিষয়ের আলোচনা আমরা আখ্যান তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

তথ্যসূত্র

১। তপোধীর ভট্টাচার্য ঙ্ম 'আখ্যানের স্বরান্তর' দিবারাত্রির কাব্য, কলকাতা ২০০৭ পৃঃ-১২।

২। ঐ, পৃঃ-১৩।

৩। অমিতাভ দাস ঙ্ম 'আখ্যানতত্ত্ব' ইন্দাস, কলকাতা ২০১০ পৃঃ-৩।

৪। ঐ, পৃঃ-৫।

৫। ঐ, পৃঃ-৫।

৬। ঐ, পৃঃ-৬।

৭। ঐ, পৃঃ-৭।

৮। ঐ, পৃঃ-২৬-২৭।

৯। ঐ, পৃঃ- ২৭।

১০। ঐ, পৃঃ-২৯।

১১। বুদ্ধদেব বসু ঙ্ম 'রাত ভোর বৃষ্টি' এম সি সরকার কলকাতা ১৯৯০, পৃঃ-১।

১২। সম্রাট দত্ত ঙ্ম 'বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ কলকাতা ২০১০, পৃঃ-৬২।

১৩। ঐ, পৃঃ-৬৩।

১৪। ঐ, পৃঃ-২৪।

১৫। ঐ, পৃঃ-৩২।

১৬। ঐ, পৃঃ-৭২।

১৭। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঙ্ম 'উপন্যাস সমগ্র' (১) আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৫, পৃঃ-৬-৭।

১৮। ঐ, পৃঃ-৭০৫।

১৯। ঐ, পৃঃ-৩-৪।

২০। অমিতাভ দাস ঙ্ম 'আখ্যানতত্ত্ব' ইন্দাস কলকাতা ২০১০, পৃঃ-৬৯।

২১। ঐ, পৃঃ-৭১।